রামদুলাল সরকার



ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

রামদুলাল সরকার

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন,
কেশবচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র দত্ত,
সম্রাট্ জর্জ্জ প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৫

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এবং

৮৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত



রামদুলাল সরকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বভাবের দোষে দেবতাও যে পশুর মত হইয়া যান তাহার যেমন বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি স্বভাবের গুণে মানুষও যে দেবতার মত হইয়া থাকে—তাহার প্রমাণও দেশের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। শুধু যে অর্থে বা বংশ-মর্য্যাদায় মানুষের মহত্ব প্রকাশিত হয় তাহা নহে, যথার্থ মহত্ব মানুষের স্বভাবে।

স্বভাব-দোষে উচ্চবংশের কোটীপতি হইয়াও যেমন সকলের নিন্দা ও ঘৃণার ভাজন হয়, আবার তেমনি স্বভাবগুণে নিতান্ত দরিদ্র—ভিখারীর ঘরে জন্মিয়াও মানুষ রাজার মত সম্মান ও দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া জগতের ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব, মহত্ব, দেবত্ব—যা কিছু—সকলই তাহার স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বভাব সৎ হইলে ভগবান তাহার সহায় হইয়া থাকেন—মানুষ সংসারে আদর্শ রাখিয়া নিজের নাম, লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজার জিনিষ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বভাব দুষ্ট ও অসৎ হইলে যত বড় লোকই হউক না কেন—কোটীপতি রাজ-রাজেশ্বরেরও নাম পৃথিবীতে সকলের কাছেই নিন্দা ও ঘৃণার বস্তু হইয়া থাকে। ইহার শত শত প্রমাণ সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়—বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসেও সে প্রমাণ বড় কম নাই।

জেলা ২৪ পরগণার ভিতরে 'দম্‌দমা' নামক স্থানটি অধিকাংশ লোকই চিনেন। ইহা কলিকাতা সহর হইতে বেশী দূর নহে—অনেকে হাঁটিয়া যাতায়াত করে। এই দম্‌দমার আশে-পাশে আরও কতকগুলি ছোট বড় গ্রাম আছে—তাহাদের একখানির নাম 'রেকজনি'।

গ্রামখানি বিশেষ বড় না হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস ছিল। তখনকার কালে গ্রামের লোকেরা কেহ চাকরি বড় করিত না। সকলেরই কিছু কিছু জমি-জমা ছিল, পুকুর ছিল, বাগান ছিল, ঘরে গাই ছিল—এই সকল হইতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে গৃহস্থের সংসার চলিয়া যাইত। ইহার উপরে যাঁহারা বাহির হইতে দশ টাকা রোজগার করিয়া ঘরে আনিতে পারিতেন, তাঁহারাই শীঘ্র বড় লোক হইয়া দেশের মধ্যে গণ্যমান্য হইয়া উঠিতেন।

কিন্তু শুধু বড় মানুষ ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লইয়াই গ্রাম বা দেশ হয় না। ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, কাঙ্গাল-গরীব, চাষাভূষোও থাকে। তেমনি এই 'রেকজনি' গ্রামেও সকল শ্রেণীর সকল রকম লোকই ছিল। দুই চার ঘর চাষাভূষোও যে পয়সাওয়ালা ছিল না—এমন নয়, আবার দুই চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্রলোকও নিতান্ত গরীব ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বলরাম সরকার।

বলরাম সরকার ভদ্র কায়স্থের সন্তান—কিন্তু বড় গরীব। তিনি বাংলা লেখাপড়া যা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহাদ্বারাই একটি পাঠশালা খুলিয়া ছেলে পড়াইয়া খাইতেন। গুরু-মশাই-গিরিতে তাঁহার নামও ছিল—সুতরাং গ্রামের অধিকাংশ ছেলেরাই তাঁহার পাঠশালে পড়িত।

কিন্তু সহরের লোকের মত পল্লীগ্রামবাসীদের সর্ব্বদা সকল কাযেই পয়সা খরচ করিবার ক্ষমতা হয় না, আপন-আপন জমি-জমা হইতে যে সকল ফসল প্রাপ্ত হয়, তাহা দিয়াই পয়সার কায চালাইয়া

লয়। ইহা এখনও অনেক পল্লীগ্রামে চলন আছে। সুতরাং বলরাম গুরুমহাশয় ছাত্রদের কাছে বেতনের বদলে ধান, চাল, কলাই, তামাক প্রভৃতি নানা রকম শস্য পাইতেন।

নিজের সংসারে যাহা খরচ হয়, তাহা ছাড়া যাহা কিছু বাঁচিত, গুরুমহাশয় মাঝে মাঝে সেই সকল লইয়া কলিকাতায় গিয়া বিক্রয় করিতেন এবং কাপড়, তৈল, লবণ প্রভৃতি যাহা কিছু কিনিবার কিনিয়া আনিতেন। এই রকমে অতি কষ্টে তিনি গরীবের সংসার চালাইতেন।

বলরাম গুরুমহাশয় দরিদ্র বলিয়া ছেলে পড়াইয়া কষ্টে-স্বষ্টে দিন গুজরাণ করিলেও, গ্রামে তাঁহার মান-সম্ভ্রম কম ছিল না। তিনি অতি সচ্চরিত্র—সদাশয়—সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন, মিথ্যা কথা জানিতেন না এবং সরল স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কোথাও বিবাদ বাধিলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া ন্যায়বিচারপূর্ব্বক মিটাইয়া দিতেন, লোকের দায়ে-অদায়ে প্রাণ দিয়া খাটিতেন, যথাসাধ্য পরের উপকার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই সকল গুণে গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও যত্ন-আদর করিত। সুতরাং গরীব হইলেও গ্রামের মধ্যে তাঁহার সম্মানের ত্রুটি ছিল না। বড় লোকেরাও তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ ও মত গ্রহণ করিতেন।

তিনি নিজে যেমন, স্ত্রীও পাইয়াছিলেন তেমনি সতী-সাধ্বী—পতিব্রতা। স্ত্রীর গুণে গুরুমহাশয় সংসারের অভাব জানিতে পারিতেন না। যখন যেমন জুটিত, তাহা হইতেই তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নী এমন গুছাইয়া সংসার চালাইতেন যে তাঁহাকে কোন দিন কোন বিষয়ে কোন প্রকার অশান্তি ভোগ করিতে হইত না। সামান্যকুটীরখানি সর্ব্বদাই

তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে থাকিত—সিঁদূর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যাইত সকলেই একবাক্যে বলিত—এমন লক্ষ্মী-মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এদেশে ইংরাজেরা এখনকার মত সকল দিকে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া গুছাইয়া বসিতে পারেন নাই—তখনো অনেক স্থান বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল—প্রায়ই রাহাজানি ডাকাতি, লুটতরাজ লাগিয়াছিল। তার উপর দেশবাসীর আরও একটা ভয়ানক ভয়ের কারণ লাগিয়াই ছিল—সেটা 'বর্গীর হাঙ্গামা'।

বর্গীরা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া এক একটা গ্রামে জলস্রোতের মত প্রবল বেগে আসিয়া পড়িত এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে লুটপাট করিয়া, মারিয়া ধরিয়া কাড়িয়া, ঘরদ্বার জ্বালাইয়া, ছারখার করিয়া দিয়া পলাইত।

তাহাদের প্রাণে মায়াদয়ার লেশমাত্র থাকিত না; অর্থের জন্য জীবন্ত লোককে পোড়াইয়া মারিত, চোখ উপড়াইয়া অন্ধ করিয়া দিত, হাত-পা কাটিয়া দিয়া যন্ত্রণা দিত। মায়ের কোল হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া তাহার সম্মুখেই আছড়াইয়া মারিত, নয় ত সর্ব্বাঙ্গে খোঁচা বিঁধাইত, শিশু আর্ত্তস্বরে কাঁদিত—যমদূতেরা দয়ামায়াশূন্য হইয়া হাসিয়া আমোদ উপভোগ করিত।

তাহারা ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র বাছিত না, লোকের অবস্থা বুঝিত না, কাহারও অনুনয়-বিনয় কান্নাকাটি গ্রাহ্য করিত না। যাহাকে সাম্‌নে পাইত—কি শিশু, কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি বালিকা, কি রমনী, কি অন্ধ-খঞ্জ-আতুর—সকলকেই অর্থের জন্য

পশুর অধিক যন্ত্রণা দিয়া মারিত। সেই জন্য যমের নামে লোকে যত ভয় পাইত, তাহা অপেক্ষা 'বর্গীর' নাম শুনিলে—লোকে শতগুণ অধিক ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

যে যেখানে যে অবস্থায় থাকিত—প্রাণের দায়ে সকল ফেলিয়া যে দিকে চক্ষু যায়, ছুটিয়া পলাইত। এইরূপে দেশ গ্রাম দেখিতে দেখিতে হতশ্রী—শ্মশান হইয়া পড়িত। বর্গীরা সমস্ত লুটপাট করিয়া আগুণ লাগাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। ইংরাজ-রাজ বর্গী-দমনের যথাসাধ্য উপায় করিলেও, তখন পর্য্যন্ত বর্গীর উৎপাৎ একেবারে কমে নাই।

তখন বলরাম সরকারের স্ত্রী গর্ভবতী। নিতান্ত দরিদ্র, ঘরে সম্বল নাই—চালে খড় নাই, নিজেকেই দিবারাত্র খাটিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া খাইতে হয়। স্বামী পাঠশালে ছেলে পড়াইয়া যা কিছু শস্য পান—তা হ'তে সকল দিন তুবেলা পেটভরা আহার পর্য্যন্ত জুটে না, তবু সতীসাধ্বী মুখটি বুজিয়া আনন্দিত মনে গুছাইয়া সংসার চালান—পতিসেবা করেন, একটি দিনের জন্য অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া দরিদ্র স্বামীর মনে ব্যথা দেন না।

তার উপর আবার সর্ব্বদাই ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি। নিজেদের খাইবার সংস্থান নাই, কিন্তু দ্বারে ভিখারী আসিলে শূন্যহস্তে ফিরে না, ঘরে অতিথি আসিলে না খাইয়া চলিয়া যাইতে পায় না। সতী-সাধ্বী নিজে উপবাস থাকিয়াও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া খাওয়াইয়া, ভিক্ষা দিয়া বিদায় করেন।

আর ব্রাহ্মণ দেখিলে তো কথাই নাই। নিজের হাতে পা ধোয়াইয়া মুছাইয়া রাঁধিয়া খাইবার সিধা আনিয়া দেন, নিজের হাতে দাবা নিকাইয়া, জল আনিয়া, বাটনা বাটিয়া সকল আয়োজন করিয়া উনান ধরাইয়া দেন। তারপর যতক্ষণ না তাঁহার আহার শেষ হয়, সকল কর্ম্ম ফেলিয়া কাছে থাকিয়া সমস্ত আদেশ পালন করেন।

তারপর, অতিথির আহারাদি চুকিয়া গেলে, যদি ঘরে রাঁধিবার মত কিছু থাকে, তবে নিজের জন্য এক মুঠা চড়াইয়া দেন—না হ'লে সে দিন উপবাসেই কাটে। স্বামী এ সব ঘটনা বড় জানিতেও পারেন না।

তা ছাড়া সকল রকম বারব্রত যথাসাধ্য ক্ষুদ-কুঁড়ো দিয়াও প্রতিপালন করেন। এইরূপে হিন্দুর ঘরের কুললক্ষ্মীর যে সকল গৃহধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য, দরিদ্র সরকার-গৃহিণী তাহার একটিও ভুলিয়া বাদ দেন না। একে তো রোজ দু'বেলা আহারের সংস্থান হওয়াই দায়, তার উপর এই সকল ধর্ম্মাচরণ জন্য মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন উপবাসে কাটে। তবু এক দিনের জন্যও স্বামী কখনও স্ত্রীর বিষণ্ণ মুখ দেখিতে পান্ না।

কিন্তু তবুও তাঁহার দেহ শুষ্ক কৃশ লাবণ্যহীন না হইয়া বরং দিন দিন আরো উজ্জ্বল—আরো সুন্দর—আরো পবিত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রূপ যেন আর ধরে না, প্রতি পদক্ষেপে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠে, যে স্থানে থাকেন সে স্থান যেন আলোকিত হয়।

যে দেখে—সে-ই আশ্চর্য্য হয়, অবাক হইয়া পরস্পর বলাবলি করে যে ভিখারী কায়স্থের মেয়ের এত রূপ কেমন করিয়া হইল? অনেকে সন্দেহ করে যে, এতদিন যখন এরূপ ছিল না—গর্ভবতী হওয়ার পরে হইয়াছে, তখন ইঁহার গর্ভে নিশ্চয়ই কোন পুণ্যবান মহাপুরুষ আসিয়া জন্ম লইয়াছেন। এইবারে দরিদ্র গুরুমহাশয়ের গৃহ পবিত্র হইবে—দুঃখ দূর হইবে।

কিন্তু সে তো অনেক দূরের কথা। গুরুমহাশয় চিন্তায় অস্থির হইলেন যে এমন দরিদ্রের ঘরে সন্তান হইলে বাঁচাইয়া রাখিবেন কেমন করিয়া? সন্তানের জন্মের সময় যেরকম সেবা যত্নের ও খরচ

পত্রের আবশ্যক, তাহা তিনি কেমন করিয়া জুটাইবেন? হয়ত প্রসব-কালেই সন্তান ও প্রসূতি একসঙ্গে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবেন। এই সকল ভাবনায় মধ্যে মধ্যে তিনি যতই অস্থির হইয়া পড়েন, আর ততই মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকেন। হায়, অজ্ঞান মানব বুঝে না যে—যিনি পাথরের মধ্যেও কীটাণুটিকে নিত্য আহার দিয়া সবল করিয়া তুলিতেছেন—তিনিই জন্মের পূর্ব্ব হইতে সন্তানের পালন-ভার ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। এদিকে প্রসবের কাল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বলরাম সরকারের পত্নীর রূপ ততই যেন আরও ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। ওদিকে সরকার মহাশয়ও প্রতি মুহূর্ত্তে বিষম ভাবনায় ভাবনায় শুষ্ক ও কৃশ হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে অন্য সকল ভাবনা ঘুচাইয়া হঠাৎ আর একটা যথার্থ বিষম ভাবনার কারণ উপস্থিত হইল।

পত্নীর প্রসবকালের আর বেশী দেরী নাই—সরকার মহাশয় অস্থির হইয়া, চারিদিকে গাঁয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী চাহিয়া, এটা ওটা সেটা ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিয়া একে একে গুছাইতেছেন—হঠাৎ একদিন রব উঠিল—বর্গী আসিতেছে!

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ছেলে বুড়ো যুবা, বালিকা রমণী, ইতর ভদ্র, ছোট বড়—সকলেই অস্থির হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল; ঘরবাড়ী কাপড়-চোপড় যথা-সর্ব্বস্ব পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, কেহ কিছুমাত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিল না। দেখিতে দেখিতে রেকজনি গ্রাম শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

যাহাদের পলাইয়া যাইবার জায়গা ছিল, তাহারা তো গেলই, যাহাদের কোথাও মাথা গুঁজিবার জায়গা পর্য্যন্ত নাই, তাহারাও সর্ব্বস্ব

ফেলিয়া এক কাপড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। পথে অনাহারে নিরাশ্রয়ে মরিবে তাও ভাল, তবুও বর্গীর অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে না।

সরকার মহাশয়ের মহাবিপদ উপস্থিত। স্ত্রী পূর্ণ-গর্ভবতী—তাহাকে সঙ্গে লইয়া কেমন করিয়া পথ হাঁটিয়া পলাইবেন? পলাইয়া যাইবেনই বা কোথায়? তেমন আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিল না—যাঁহারা ছিল তাঁহারা তাঁহার অপেক্ষাও দরিদ্র—যথার্থ ভিক্ষুক। অথচ না পলাইলেও উপায় নাই।

এখনি বর্গীরা আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ চিরিয়া সন্তান বাহির করিবে—হয়তো তাঁহাদের চক্ষুগুলি উপাড়িয়া তুলিয়া লইবে—হয় তো কিরীচের খোঁচায় বিঁধিয়া বিঁধিয়া মারিয়া ফেলিবে। ওঃ—সে সব কথা স্মরণ করিলেও আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে!

তিনি আর ভাবনা চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না। গ্রামের সকলেই পলাইয়াছে—তাঁহারাই একাকী পড়িয়া আছেন। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে হয়তো বর্গীরা আসিয়া পড়িবে। তিনি আর কোন দিকে চাহিলেন না। অত্যন্ত বিপদের সময়ে মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারও হইল।

ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তিভরে ঈশ্বরের উপর আপনাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিয়া, "জয় মা দুর্গা, দেখো মা" বলিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া সাবধানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে মনুষ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না—বর্গী আসিবার কথা যতদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল, ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত গাঁয়ের ঘর-বাড়ী গুলি শূন্য পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছিল। পত্নীর হাত ধরিয়া সরকার মহাশয়, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল যে

শীঘ্র তাঁহারা যে আবার লোকালয়ের মুখ দেখিতে পাইবেন তাহার আশা মাত্র নাই।

ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, তাড়াতাড়িতে তাঁহারা যে পথ ধরিয়া পলাইতেছিলেন, সেটা কলিকাতার সিধা রাস্তা নহে। দিন দুই পরে যখন অবসন্ন হইয়া দু'জনেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের পথ ভুল হইয়াছে—এতক্ষণে কলিকাতায় পৌঁছিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা এক নির্জ্জন মাঠের ধারে বনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছেন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সেই সময়ে সরকার মহাশয়ের পত্নী হঠাৎ প্রসববেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। সরকার মহাশয় চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু যিনি বিপদের বন্ধু, অনাথের নাথ, তিনি যে আগন্তুক ক্ষুদ্র প্রাণীটির জন্য নিরাপদ কোল পাতিয়া বসিয়াছিলেন—তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারেন নাই।

সেই নির্জ্জন প্রদেশ আলো করিয়া এক দিব্য কুমার ভূমিষ্ঠ হইল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জগদীশ্বরের এমনি বিচিত্র বিধান যে, যিনি ভুবনবিখ্যাত দিল্লীর বাদশাহ—'দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা'—বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত, সেই আকবর বাদশাহও এক দিন এমনি নিরাশ্রয়ভাবে, গৃহচ্যুত—দরিদ্র মাতার ক্রোড় আলোকিত করিয়া, এমনি নির্জ্জন প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা কি এ কথা তখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই সন্তান একদিন এককালে দিল্লীর তক্তে বসিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সম্রাটরূপে চিরদিন জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন ? না অন্য কেহ খেয়ালের বশেও সে কল্পনা মনে স্থান দিতে পারে ?

তেমনি করিয়া কত যুগ-যুগান্তর পরে বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের গৃহ-বিচ্যুত, পলায়িত, অনাথ দম্পতির ক্রোড় আলোকিত করিয়া আজ আবার এই নবশিশু তেমনি নির্জ্জন স্থানে ভূমিষ্ঠ হইল। কে বলিতে পারে যে সেই ভুবনবিখ্যাত ভারত-সম্রাট্ আকবর শাহের ভাগ্যসূত্রের মত, এই শিশুরও ভবিষ্যৎ ভাগ্যসূত্র জগদীশ্বর কোন্ উচ্চ পথে যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন ?

নির্জ্জন—নির্ব্বান্ধব স্থান, লোক নাই—জন নাই—বন্ধু নাই—বান্ধব নাই। একবার উঁকি মারিয়া দেখে, কি ডাকিয়া দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করে—এমন জনপ্রাণীও নাই, অথচ তখন তাঁহাদের লোকবলের কত প্রয়োজন ? শিশু ও প্রসূতির সেবা শুশ্রূষার কত প্রয়োজন ? বলরাম কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

কিন্তু বলরাম ভাবিয়া না পাইলেও—যাঁহার কার্য্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকলদিক বাঁধিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সকল জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্ত ভার আপনার উপর তুলিয়া লইয়া দরিদ্র—অনাথ—ভীত—পলায়িত—মুমূর্ষু দম্পতিকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

যে বিষয়টা মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ও শক্তির অতীত, সেই বিষয়টাকে আমরা দৈবের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু মঙ্গলময় বিশ্বপাতা যে সকলের উপরে সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া থাকিয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাকে একসূত্রে বাঁধিয়া অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত চালাইতেছেন তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না।

শুষ্ক মাটীর উপর কখন যে লোকচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র বীজটি পড়িয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন মাটী ফুঁড়িয়া সেটি গজাইয়া উঠে, তারপর

ডালপালা পাতা মেলিয়া কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়। তখন দেখিলে কেহ কি ভাবিতে পারে যে অতি ক্ষুদ্র—পরমাণুর মত—একটি অদৃশ্য বীজ হইতে এত বড় গাছটা মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে ?

প্রাণী-জগতের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা অথবা কীটের অতি ক্ষুদ্র ডিম্বটি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়—কোন্ অতলে লুপ্ত হইয়া থাকে। প্রখর সূর্য্যতাপে মেদিনী দগ্ধ হয়, মাটী ফাটিয়া যায়, জল শুকাইয়া যায়; প্রচণ্ড ঝড়ে ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে, বৃক্ষসকল ধূলিসাৎ হয়, দেশগ্রাম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ওলট পালট হইয়া যায়; প্রবল বন্যায় সমস্ত ভাসাইয়া বিশ্বসৃষ্টি একাকার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু সেই পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র—তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ—অদৃশ্য ডিম্বটির গাত্রে কোথাও একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে না। সে যথাসময়ে আপনার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া একদিন পৃথিবীর বক্ষের উপর ফুটিয়া একটি নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া দেয়।

যে অনন্তক্ষমতাবান—অনন্তমঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান বলে পৃথিবীতে নিত্য এমন কত শত শত অত্যন্ত অদ্ভুত, স্বপ্নাতীত ব্যাপার সকল ঘটিতেছে, তাঁহারই মঙ্গলবিধানের বশবর্ত্তী হইয়া নির্জ্জন, নির্ব্বান্ধব স্থানে, সহায়-সম্পদ-হীন, পথের কাঙ্গাল দম্পতির ক্রোড়ে যে ক্ষুদ্র প্রাণীটি প্রথম ধরার আলোকে চক্ষু মেলিল—তাহার লালন-পালন এবং জীবন রক্ষার উপায় জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই সেই বিরাটপুরুষ যে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা কে করিতে পারে ?

সুতরাং শিশুর কেশাগ্র পর্য্যন্তও নষ্ট হইল না, কোন রকম অমঙ্গলের ছায়া পর্য্যন্ত তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারিল না। দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে রাজার পুত্রেরা যেমন সুরক্ষিত হইয়া বাস করে—পিতা-মাতার স্নেহরূপ অটল দুর্গের ভিতরে সেই শিশুও তেমনি সুরক্ষিত হইয়া দিন দিন বাড়িতে চলিল।

জগদীশ্বরের কৃপায় বলরাম সরকার দরিদ্রের গ্রামের মধ্যে—দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় পাইলেন, দরিদ্রের সঙ্গে দীনভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে তাঁহাদের দীনের সন্তানটিকে অত্যন্ত দীনভাবে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীন কাঙ্গালের ঘরে দীন কাঙ্গালের মত প্রতিপালিত হইলেও পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা-যত্ন লাভে সেই দীনের নন্দন—রাজপুত্রদের অপেক্ষা কোন অংশে বঞ্চিত হইল না।

বড় মানুষের ছেলেদের সঙ্গে তাহার খাওয়া-পরার যে ত্রুটি, যে অভাব, যে পার্থক্য—তাহা পিতমাতার স্নেহে পূর্ণ হইতে লাগিল।

কিন্তু তাহা হইলেও এই শিশুর বাল্যজীবন সুখে কাটিল না। দেশে থাকিতে বলরাম সরকার যেমন অতি কষ্টে-সৃষ্টে ভিখারীর মত কোন রকমে সংসার চালাইতেন, এখনও তেমনি ভাবে অতি কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে উদরান্নের সংস্থান করিতে লাগিলেন। সুতরাং বালকের ভাগ্যে ভাল খাওয়া—ভাল পরা কেমন করিয়া জুটিবে ?

শৈশবহইতেই দীনের সন্তান অত্যন্ত দরিদ্রভাবে, কঠোর রকমে কোন মতে জীবন-ধারণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সুতরাং তাহার স্বভাবও সেই অনুযায়ী—দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের মত, নিতান্ত নম্র—নিতান্ত বিনয়ী—অত্যন্ত শান্ত—কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধনীর সন্তানেরা শৈশব হইতে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পাইয়া আপন-আপন স্বভাব-চরিত্র গঠন করিয়া তুলিবার সুবিধা পায়, কিন্তু বলরামের পুত্রের সে সুবিধা ঘটিল না। তিনি দুইবেলা পেট ভরিয়া মোটামুটি আহার জুটাইতেই অক্ষম—পুত্রকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কোথা হইতে করিবেন ? নিজে যা কিছু সামান্য রকম বাংলা লেখাপড়া জানিতেন—পুত্রকেও তাহাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তা হউক ; পুত্র উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না পাইলেও তাহার চরিত্র-গঠনে বিঘ্ন জন্মিল না। সে মা-বাপের দেখিয়া দেখিয়া

এবং স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে আপনাহইতেই আপনার স্বভাব-চরিত্র উত্তমরূপ গড়িয়া তুলিতে লাগিল। দুঃখই মানুষকে বুদ্ধিশালী করিয়া তুলে, দুর্দ্দশাই তাহার আত্ম-নির্ভরের সোপানস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বলরামের পুত্রেরও তাহাই ঘটিল। শৈশব হইতে সে পরম গুণবান, স্বচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। এই আদরের সন্তানটির বাপ-মা আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন— **রামদুলাল**।

কিন্তু ভগবান যাহাকে পরীক্ষার সাগরে নিক্ষেপ করেন, তাহার উপর দিয়া অনেক সহাইয়া লন। বাল্যকালে রামদুলালের মাথার উপর দিয়াও বড় বড় দুঃখের ও শোকের ঝড় বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে তাহার সহিষ্ণুতা, নম্রতা, ধীরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ-গুণরাশি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইয়া তাহার ভবিষ্যতের জন্য সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথ বাঁধাইয়া দিয়া গেল।

তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের তিনটি প্রাণীরই ভাল করিয়া দুই বেলা খাইতে মিলে না—পরিতে কাপড় জুটে না, ভগবান সময় বুঝিয়া বল-রামের মাথার উপর বোঝার উপরে আরো বোঝা চাপাইয়া দিতে লাগি-লেন। বৎসর চারি পাঁচ অতিবাহিত হইতে না হইতে রামদুলালের আরও একটি ভাই ও এক ভগ্নী জন্মিল।

দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসার চারিদিক হইতে গুরুভার প্রস্তর খণ্ডের মত একেবারে বলরামের ঘাড়ের উপরে চাপিয়া পড়িল। তিনি ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রামদুলাল বালক হইলেও সকলের বড়। মাতা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় ছোট ছেলেমেয়ে দুটির দেখাশুনা, আদর-যত্ন করিবার সময় পান না—কাজেই সে দুটির ভার বালক রামদুলালের ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িল। সে তাহাতে কিছুমাত্র কাতর হইল না, বরং অধিকতর

উৎসাহের সহিত ভাই-বোন দুটিকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল।

রামদুলাল নিজে আধপেটা খাইয়া—বাপমাকে লুকাইয়া ভাইবোন দুটিকে পেট ভরিয়া খাওয়ায়, নিজে খালিগায়ে থাকিয়া, গায়ের কাপড়খানি দিয়া শিশুদুটির সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, নিজের খেল্না-ধূলা, পড়া-শুনা, কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের লইয়া খেলা করে। ভাই-বোন দুটি দাদার এমন অনুগত হইয়া পড়িল যে রামদুলালকে ছাড়িয়া তাহারা একদণ্ড থাকিতে পারে না।

এইরূপে, বয়সে বালক হইয়াও রামদুলাল বয়স্থ লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারগ হইয়া উঠিল। শিশুদুটির জন্য বাপ-মায়ের যত না ভয়-ভাবনা-উৎকণ্ঠা, রামদুলালের তাহার অপেক্ষাও সে ভাবনা অনেক বেশী। পরদিন সকালে উঠিয়া শিশুদুটি কি খাইবে, তাহার ব্যবস্থা সে আপনিই আগের দিন হইতে করিয়া রাখে, পাছে অসুখ হয়, সেই জন্য সর্ব্বদা সাবধানে সতর্ক-দৃষ্টি রাখে। দেখিয়া শুনিয়া পিতা-মাতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

এইরূপে নানা দুঃখের ভিতর দরিদ্রের সংসারে কোন রকমে ক্ষুদ-কুঁড়ায় পেট ভরাইয়া, ছেঁড়া নেকড়ায় দেহ ঢাকিয়া তিনটি শিশুতে তাহাদের শৈশব জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। হায়, তখন কে ভাবিয়াছিল যে এত দুঃখ কষ্টের উপরেও আবার দুঃখের বজ্র রামদুলালের মাথায় পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া কড়্কড়্ করিয়া ডাকিতেছিল? বছর দুই কাটিতে না কাটিতে সে বজ্র সবলে পড়িয়া বালকের দুঃখের সংসার চূর্ণ করিয়া দিয়া গেল।

তখন রামদুলালের বয়স আট বৎসরও হয় নাই, সেই সময়ে কঠিন ব্যারামে পড়িয়া তাহার জননী ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়েগুলি আকুল হইয়া ছট্ফট্ করিতে করিতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্রাঘাতের উপর আবার বজ্রাঘাত। চক্ষের জল শুকাইতে না শুকাইতে, মাতার কথা ভুলিতে না ভুলিতে, সংসারের বন্দোবস্ত ফিরিতে না ফিরিতে, দুইটা মাস পর্য্যন্ত না কাটিয়া যাইতে যাইতে তিনটি অপোগণ্ড শিশুকে একেবারে অকূল পাথারে ভাসাইয়া রামদুলালের পিতা বলরাম সরকার মহাশয়ও পরলোকে গমন করিলেন।

রামদুলালের চারিদিকে অকূল পাথার। নিজে জ্ঞানহীন বালকমাত্র, তার উপর দুইটি একেবারে অপোগণ্ড শিশুর সমস্ত ভার—সমস্ত দায়িত্ব—সমস্ত জীবন পর্য্যন্ত তাহার উপর চাপিয়া পড়িল।

বালক রামদুলাল যে বাপ-মায়ের জন্য দু'দণ্ড প্রাণ খুলিয়া, ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া জুড়াইবে—তাহারও উপায় নাই—অবসর নাই। অনাথ—অবলম্বনশূন্য—ক্ষুধাতুর শিশু ভাই-বোন-দুটি যে বালক-দাদার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। পাখীর মত আদার কুড়াইয়া সে তাহাদের মুখে আনিয়া দিবে—তবে তাহারা খাইয়া বাঁচিবে!

হরি—হরি—একি বিধির বিচিত্র বিধান!

অকূল সাগরের বুকে নৌকা-ডুবি হইলে মানুষেরা যেমন প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়া—সম্মুখে একগাছা কূটা ভাসিয়া যাইতে দেখিলেও, আগ্রহের সহিত গিয়া জড়াইয়া ধরে, রামদুলালও তেমনি এই অকূল-পাথার সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন কিছু একটা অবলম্বন খুঁজিতে লাগিল।

রামদুলালের মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাস কলিকাতায় বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা তাহাদের অবস্থার অপেক্ষা কোন অংশে

ভাল ছিল না, বরং বলিতে গেলে আরও হীন—আরও খারাপ ছিল। রামদুলালের পিতা বলরাম সরকার অতি দরিদ্র হইলেও নিজে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যাহা হৌক দু'মুঠা উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর—রামদুলালের মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের সে ক্ষমতাও ছিল না।

রামসুন্দর ভদ্র কায়স্থের সন্তান হইয়াও উদরের দায়ে দ্বারে দ্বারে প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন। একে সহরে বাস—তার উপর লেখাপড়া জানিতেন না, সহায়, সম্বল, মুরুব্বি কি অভিভাবক কেহই ছিল না, কাজেই দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন তাঁহার আর দ্বিতীয় অবলম্বন জুটে নাই।

ভিক্ষুক বলিলেই আজকাল আমাদের মনে যেমন একটা ঘৃণার সঞ্চার হয়, সর্ব্বাপেক্ষা হীনবৃত্তি ভাবিয়া লোকে যেমন উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে, তখনকার কালে ঠিক তেমনতর ছিল না। এখনকার ভিখারীরা সাধারণতঃ ইতর জাতীয়—হীন-স্বভাবসম্পন্ন—চোর, জুয়াচোর, বাটপাড়, বদমাইস হইয়া থাকে, কিন্তু সে কালে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি সৎস্বভাবসম্পন্ন ভদ্রসন্তানও নিরুপায় হইলে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। অসৎ উপায়ে অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করার অপেক্ষা তাঁহারা, কেহ কেহ বা সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, কেহ কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন।

তাহাতে লোকে এখনকার দিনের মত ঘৃণা করিত না, বরং সৎস্বভাবসম্পন্ন বলিয়া আদর করিয়া ভিক্ষা দিত এবং যাহার যেরূপ সম্মান প্রাপ্য তাহাকে সেইরূপ সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি করিত না। এখনও সুদূর পল্লীগ্রামের ভিতরে এইরূপ ভিক্ষাজীবী দুই একজন ভদ্রলোক যে দেখিতে পাওয়া যায় না—এমন নহে।

এই শ্রেণীর ভদ্রলোক ভিক্ষুকগণ যে শুধু নিজের উদরান্নের জন্য

এইরূপে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন তাহা নহে, এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রমতে সংসার চালাইয়া হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ এবং ধর্ম্মাচরণ পর্য্যন্ত করিতেন।

ইঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন, তবু ইঁহাদের দ্বারেও ভিক্ষুক আসিলে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যায় না, গৃহে অতিথি আসিলে, সমাদর পূর্ব্বক যথাসাধ্য তাঁহার সৎকার না করিয়া ছাড়েন না, লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন না এবং সকল রকম বারব্রত, পূজা-আর্চ্চা, ক্রিয়া-কলাপ শাস্ত্রমত সম্পন্ন করিতে কাতর হন না। সুতরাং ভিক্ষুক হইলেও এই শ্রেণীর লোকেরা ভদ্রসমাজের ভিতরেই সমাদরে স্থান পাইয়া ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

রামদুলালের মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাস মহাশয়ও এই শ্রেণীর ভিক্ষুক ছিলেন। যেমন তিনি স্বয়ং—পত্নীও পাইয়াছিলেন তেমনি ধর্ম্ম-পরায়ণা—পতিব্রতা—স্বাধ্বী-সতী। সুতরাং কলিকাতায় যে স্থলে তাঁহাদের বাস, সেখানকার সকলেই তাঁহাদের আদর যত্ন ও সম্মান করিত। তবে অদৃষ্টদোষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখের সংসার অতি দীনভাবেই চালাইতে হইত। কোন প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যে সংসার চালাইতে হইত না—এইজন্য স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন।

রামদুলাল যখন দেখিল যে সংসারে তাহার মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান নাই—একটি দিনেরও খাইবার ও ভাই-বোন দুটিকে খাওয়াইবার একমুষ্টিও সংস্থান নাই—একটা লোকও দুঃখে 'আহা' বলিবার নাই, তখন নিরুপায় হইয়া শিশু ভাই-বোন দুটিকে সঙ্গে লইয়া দীনের দীন—কাঙ্গাল—ভিখারী মাতামহের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা ভিন্ন তখন আর দ্বিতীয় উপায় সে দেখিতে পাইল না।

বিশ্বাস মহাশয়ের ভিক্ষুকের সংসারে স্বামী-স্ত্রীর দুঃখ কষ্টের অবধি ছিল না, তবু যখন অপোগণ্ড দৌহিত্র দৌহিত্রী তিনটি নিরাশ্রয় হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি তাহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। বিমুখ করা দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রী পরম সমাদর পূর্ব্বক নাতি-নাত্‌নী তিনটিকে গৃহে লইয়া আশ্রয় দিয়া রাখিলেন। বালক রামদুলাল একটা ভাবনার হাত হইতে রক্ষা পাইল।

কিন্তু তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রী দুই জনেরই স্বচ্ছলে চলে না—তাহার উপরে এই তিনটি শিশুকে প্রতিপালন করিবেন কেমন করিয়া? নিজেরা একবেলা উপবাস করিয়া থাকিতে পারেন, দুইটা চাউল কি ছোলা দাঁতে কাটিয়া জল খাইয়া কাটাইয়া দিতে পারেন, সম্পূর্ণ উপবাসেও থাকিতে পারেন, কিন্তু বালক-বালিকাগণের মুখে তো আহার না দিয়া পারিবেন না, তাহাদের তো বস্ত্র না দিয়া পারিবেন না—জল খাবারের সময়েও একটু কিছু না দিতে পারিলে তাহাদের যে কষ্ট হইবে, তাহা যে তাঁহাদের সারাদিনের উপবাসের অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক! শিশুগুলির সে কষ্ট দেখিয়া কেমন করিয়া নীরবে থাকিবেন?

বিষম ভাবনার কথা বটে, কিন্তু তাহাতেও তিনি ভীত বা নিরাশ হইলেন না। ভগবানের উপরে তাঁহার অটল ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল—সেই ভরসা করিয়া বুক বাঁধিলেন।

বিশ্বাস মহাশয় পূর্ব্ব হইতে অধিক পরিশ্রমে উদয়াস্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষায় কিছু অধিক উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে একেবারে ফল হইল না এমত নহে, তবে সে উপার্জ্জনেও এতগুলি শিশু প্রতিপালন পূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তাঁহার সামর্থ্যে তো আর কুলাইল না—কি উপায় হইবে? তখন বিশ্বাসমহাশয়ের সাধ্বী পত্নী—রামদুলালের দিদি-মা লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ধান ভানিয়া, চাউল কাঁড়িয়া, কাজ-কর্ম্ম

করিয়া দিয়া নিজেও যথাসাধ্য উপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বামীর সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দীনের সহায়—দীনের আশ্রয়—দীনের ভরসা দীননাথ। মানুষকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিশ্বসংসার তিনিই প্রতিপালন করিতেছেন, নহিলে ক্ষুদ্রশক্তি মানবের এমন কি সাধ্য যে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে? সেই দীননাথ এই দীন-পরিবারকে ভুলিলেন না। স্বামী-স্ত্রীর—দুজনার উপার্জ্জনে যাহা কিছু আসিতে লাগিল, তাহাতেই কোনরকমে কষ্টে-সৃষ্টে শিশুগুলিকে তাঁহারা যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজ-ভোগ বা মোণ্ডা-মিঠাই না পাইলেও রামদুলাল আর তাহার ছোট ভাই-বোন দুটি দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

মাতামহের আশ্রয়ে শিশুগুলি কোনমতে অতি কষ্টে-সৃষ্টে মানুষ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রামদুলাল আর তাহার ছোট ভাইটির লেখাপড়া শিখিবার কোনরকম বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না।

কিন্তু তাহাতে বালকবালিকাগণের চরিত্রগঠনে কোন প্রকার বাধা জন্মিল না। স্বয়ং বিশ্বাসমহাশয় এবং তাঁহার পত্নী পরম সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্ম্ম-পরায়ণ দম্পতি, তাঁহাদের গৃহে সর্ব্বদাই, ভিক্ষা-প্রদান, অতিথি-পারণা, বার-ব্রত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম লাগিয়া থাকিত, সুতরাং শৈশব হইতে সেই সংসারে প্রতিপালিত হইয়া বালকবালিকাগণের প্রকৃতিও সেই অনুযায়ী ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার উপর, কর্ত্তা এবং গৃহিণী সময় পাইলেই নাতি-নাতনী গুলিকে কাছে বসাইয়া সুশিক্ষা ও সৎউপদেশ দিতেন, সঙ্গে লইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মগুলি করিতেন, সুতরাং চক্ষের উপর দাদা-মহাশয় ও দিদিমার আদর্শ দেখিয়া এবং তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়া তাহারাও সকল শিক্ষা করিতে লাগিল।

রামদুলালের দিদি-মা প্রত্যহই ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন এবং প্রতিদিনই যাইবার সময় কাপড়ে বাঁধিয়া কিছু কিছু চাউল লইতেন। স্নানের পথে সেই চাউল ভিক্ষুকগণকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া আসিতেন। কি আশ্চর্য্য—ভিক্ষাই যাঁহাদের এ সংসারে একমাত্র উপজীবিকা, তাঁহারাও সেই ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীতে দয়ায় গলিয়া আবার গরীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেন! সুতরাং দয়াল জগদীশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া থাকিতে পারিবেন কেন?

বালকবালিকারাও দিদিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতে যাইত এবং দিদিমার কাছ হইতে চাউল লইয়া ভিখারীদের দিত। এইরূপে তাহাদের হৃদয়েও সেই শৈশবজীবন হইতে দয়াগুণ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর আবার সুখ—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। চিরদিন কাহাকেও সমানভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তাহা হইলে মানব সুখে বিরক্ত হইয়া উঠিত এবং দুঃখের চাপে পিষিয়া মরিত। এইবারে বিশ্বাসমহাশয়ের সময় একটু ভালোর দিকে ফিরিল।

রামদুলালের দিদিমা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থলোকের গৃহিণীগণের সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্ত্তা হইত। এইরূপে বিশ্বাস-গৃহিণী সকলেরই পরিচিত হইয়াছিলেন। সকলেই স্বভাবগুণে তাঁহাকে ভালবাসিত এবং তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত।

তখনকার সময়ে হাটখোলার বাবু মদনমোহন দত্ত কলিকাতার ভিতরে একজন খুবমস্ত ধনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নানা রকমের কারবার—অনেক জমী-জমা, তালুক-মুলুক—রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড অট্টালিকা—সরকার-গোমস্তা-মুহুরি, চাকর-দরোয়ান-ঝি, লোকজনে বাড়ী সর্ব্বদাই সরগরম। গাড়ী ঘোড়া, পালকী বেহারা—বড় মানুষীর কোন কিছুর অভাব নাই।

প্রত্যহ বিস্তর লোক খায়—দলে দলে ভিক্ষুক ভিক্ষা লইয়া যায়—কন্যাদায়ে পড়িয়া, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের সাহায্যের জন্য—আরো কত কারণে শত শত প্রার্থী আসিয়া অভাব জানাইয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—কেহই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না। তাহা ছাড়া বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়া থাকে, ভিখারী-অতিথি পেট ভরিয়া খাইয়া জয় জয় করে। প্রকৃত পক্ষে বড় মানুষ যাহাকে বলে—জগদীশ্বর তাহা ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের সংসারে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে সংসারে লক্ষ্মী যেন তাঁহার সোণার সিংহাসন পাতিয়া দিবারাত্রি বিরাজ করিতেছেন।

দত্তমহাশয়ের গৃহিণীও মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। সেই সূত্রে রামদুলালের দিদিমার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।

তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া দত্ত-গৃহিণীর হৃদয় দয়ায় গলিয়া গিয়াছিল, গঙ্গাস্নানে আসিয়া অনেক সময়ে অনেক রকম সাহায্য করিতেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার সৎস্বভাবের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে পাইলেন, তখন তাঁহার উপর এমন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ জন্মিল যে কোন রকমের একটা কিছু চিরস্থায়ী উপকার করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

সুযোগের অভাব নাই—শীঘ্রই মিলিল। এক দিন বলিয়া কহিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়া পাঁচ' টাকা বেতনে পাচিকার কার্য্যে

নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রামদুলালের দিদিমা এই ধনীর গৃহিণীর নিকট হইতে এরূপ আশাতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন এবং জগদীশ্বরকে প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

এতদিন পরে আশা হইল যে নাতি-নাত্‌নীগুলির একটা হিল্লে লাগাইয়া দিতে পারিবেন। আর যে তাহাদের কখনও উপবাসের সম্ভাবনা রহিল না, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের যে এই প্রভুর আশ্রয়ে আনিয়া একটা না একটা নিরাপদ স্থান করিয়া দিতে পারিবেন—এই আশাতেই আনন্দিত হইয়া দশগুণ উৎসাহের সহিত আপনার ঘরের মত করিয়া পরম যত্নে পাচিকার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভদ্র ঘরের ধার্ম্মিকা রমণী বলিয়া তিনি শীঘ্রই পরিবারের সকলেরই শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

ক্রমে এই উপলক্ষ্য ধরিয়া বিশ্বাসমহাশয় এবং তাঁহার নাতি-নাত্‌নীগুলির এ বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ হইল—পরিচয় ঘটিল, সর্ব্বদাই নানা-প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়া সংসারের দুঃখ-কষ্ট অনেক অংশে লাঘব হইতে লাগিল।

দত্তমহাশয়ের সংসারে ঘরের এবং বাহিরের শত শত লোক নিত্য খাইত, থাকিত, প্রতিপালিত হইত। সে বিষয়ে কোন রকম বাঁধাবাঁধি বা কড়াকড়ি নিয়ম কিম্বা আইন-কানুন ছিল না—সুতরাং দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে নাতি-নাত্‌নীগুলিও আসিয়া অতি সহজে সেখানে মিশিয়া যাইতে পারিল।

বিশেষ রামদুলাল শীঘ্রই সেখানে পরিচিত হইয়া আপনার অধিকার আপনি পাতিয়া বসিতে সমর্থ হইল। তাহার মত সরল, নির্ম্মল-চরিত্রের বালক স্বভাবগুণে আপনা হইতেই সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। সৎস্বভাব যাহার—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

সকলেই তাহার পরম আত্মীয় হইয়া উঠে—তাহার জন্য অনুনয়-বিনয়, সই-সুপারিশের আবশ্যক হয় না।

স্বয়ং মদনমোহন দত্ত মহাশয় শীঘ্রই রামদুলালের সৎস্বভাব ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলেন এবং তখন হইতে সেই বাড়ীতেই ভাই-ভগ্নীগুলিকে স্থান দিয়া আপনার সন্তানের মত রামদুলালকে যত্ন-আদর করিতে লাগিলেন এবং তাহার লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তখনকার দিনে সর্ব্বাগ্রে তালপাতায় লিখিতে শিখিয়া, কিছুদিন তাহাতে লিখিয়া লেখায় ভাল-রকম হাত বসিলে, শেষে কলাপাতার উপর লিখিয়া হাত পাকাইতে হইত। রামদুলাল মদনমোহন দত্তের বাটীর ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দেখিয়া দেখিয়া তালপাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল এবং পরের বই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভানে একটু একটু কঠিন পড়া শিখিতে লাগিল।

এই প্রকারে কিছুকাল কাটিয়া গেলে তাহার তালপাতার লেখা শেষ হইল, অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত উত্তম হস্তাক্ষর তালপাতায় লিখিয়া হইতে পারে তাহা হইল, এইবার হাত পাকাইতে হইবে, সুতরাং কলাপাতার উপরে লেখার আবশ্যক হইয়া উঠিল। এখন কিছুদিন কলাপাতার উপর লিখিয়া হাত পাকাইতে পারিলেই লেখা শেষ হইবে।

কিন্তু রামদুলাল কলাপাতা পাইবে কোথায়? এ কলিকাতা সহর—পল্লীগ্রাম নহে যে, লোকের বাগান হইতে চাহিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিবে, এখানে মাটী পর্য্যন্ত কিনিতে হয়, তা কলাপাতা তো দূরের কথা। কিন্তু তাহার এমন সঙ্গতি নাই যে এক আধ পয়সার কলাপাতা মাঝে মাঝে কিনিয়া লয়। অথচ লেখা পাকানো চাই। রামদুলাল যে কি উপায়ে কলাপাতা সংগ্রহ করিয়া লইবে, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

মদনমোহন দত্ত মহাশয় বহু ছাত্রের পড়াশুনার ব্যয়ভার জানাইলেই বহন করিতেন। কিন্তু সে কথা তাঁহাকে জানাইতে রামদুলালের অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। একে তো তিনি দয়া করিয়া তাহার অন্নের ভার লইয়াছেন—তাঁহার কৃপায় আর পেটের ভাবনা নাই, তার উপর তাঁহার স্কন্ধে আর কত ভার চাপাইয়া দিবে?

তদ্ভিন্ন আর এক বিশেষ বাধা এই যে, রামদুলাল অত্যন্ত আত্ম-নির্ভরশীল। কোন বিষয়েই সে পরের উপর সহজে নির্ভর করিতে চাহিত না—নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা ঐকান্তিক প্রবল। সুতরাং সে কিছুতেই দত্ত-মহাশয়ের কাছে পাতা কিনিবার পয়সা চাহিতে পারিল না, ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিল।

দত্তমহাশয়ের বাটীর ছেলেরাও অনেকে কলাপাতায় লিখিত। তাহারা এক একখানি পাতায় একবার মাত্র লিখিয়া সে পাতাখানি ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন পাতায় লিখিতে আরম্ভ করিত। রামদুলাল সেই সুযোগ পাইল।

দত্তবাড়ীর ছেলেদের পরিত্যক্ত লেখা-পাতাগুলি এক এক করিয়া কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল, তারপর সেই লেখা-পাতাগুলি বেশ করিয়া ধীরে ধীরে রগড়াইয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া শুকাইতে দিত। সেগুলি শুকাইলে তাহার উপর নিজে লিখিত।

এইরূপে সেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল বালক দত্তবাড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় প্রভৃতি থাকিলে যে কোন কার্য্যে সে যে পারদর্শী হইতে পারে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই। চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মনির্ভরতার বলে বহু ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থায় জন্মিয়াও অসাধ্য-সাধন করিয়া এ সংসারে স্বীয় যশ অক্ষয় ও নাম অমর করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান সকল মানুষকেই অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল গুণ দান করিয়াছেন, কেহই একেবারে গুণের আকর অথবা একেবারে নির্গুণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং যাহাঁর ভিতরে সেই সকল সদ্‌গুণরাশি যতটুকু পরিমাণে থাকুক না কেন, সে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় তাহা বাড়াইয়া লইতে পারে। শাণ দিতে দিতে যেমন লৌহ-অস্ত্রের মরিচা উঠিয়া গিয়া ধার বৃদ্ধি হয়, তেমনি অনবরত চর্চ্চা করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণরাশি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে সেই সকল গুণরাশি বৃদ্ধি পাইলে সে ব্যক্তি এই সংসারে অত্যন্ত অসাধ্য কার্য্যসকলও স্বচ্ছন্দে সমাধা করিয়া চিরকালের জন্য কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে।

পিতার কাছে শৈশবে রামদুলালের যেটুকু বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, বলিতে গেলে, তাহা কিছুই নহে। তিনি মুখে মুখে সুবিধামত, যখন যেটুকু পারিয়াছিলেন সেটুকুই শিক্ষা দিয়াছিলেন,—সে শিক্ষার ফল কিছুই হইতে পারে না, তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষা হইয়াছিল তাহা মদনমোহন দত্তের গৃহে থাকিয়া এবং সম্পূর্ণ আপনার শক্তি ও চেষ্টার বলে।

মদনমোহন দত্ত রামদুলালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে বালককে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে

সতত সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি বহু বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতেন। যদি রামদুলাল কখনো তাঁহার নিকট গিয়া সেজন্য কোন প্রকার সাহায্য চাহিত, তাহা হইলে তিনি যে তদ্দণ্ডেই সে সাহায্য করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রামদুলাল ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার নিকটে সে সাহাষ্য চাহিত না, সে দরিদ্রের সন্তান, সে ভাবিত—যদি আপন চেষ্টায় আপনি উঠিতে পারা যায়, তাহার অপেক্ষা গৌরবের বস্তু এ জগতে আর নাই। এই ভাবিয়া সেই আত্মনির্ভরশীল বালক সেই বাল্যকাল হইতেই কেবলমাত্র নিজের চেষ্টার বলে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদুলাল দত্তমহাশয়ের বাড়ীর ছেলেদের কাছে থাকিয়া অবসর মত তাহাদের পুস্তক পড়িয়া লেখাপড়া শিখিতে-ছিল, সুতরাং তাহার আর স্বতন্ত্র বই কি খাতাপত্র ছিল না। সেই ভাবে—পরের পড়া হইয়া গেলে পরে, তাহার বই লইয়া আপনি প্রাণপাত পরিশ্রমে শিখিতে চেষ্টা করিত, তাহাদের অবসর সময়ে এটা, ওটা, সেটা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইত। তাহাদের লেখার পরে ফেলিয়া দেওয়া কলাপাতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া—আবার ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া তাহাতে নিজে লিখিত।

এইরূপে বছর কতকের ভিতরে সে বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া ফেলিল। যে বালক ওই প্রকার পরিশ্রমে কেবল নিজের উপর নির্ভর ও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া সাধনা করিতে পারে, তাহার সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হয় না।

শুধু যে রামদুলাল ওই প্রকার উপায়ে কেবল বাংলা ভাষাই শিখিল তাহা নহে, কতকগুলি ইংরাজী শব্দ এবং কথাও মুখস্ত করিয়া শিখিয়া ফেলিল, উত্তমরূপ অঙ্ক শিখিয়া হিসাব প্রভৃতি করিতে শিখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের লেখাও পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হইয়া পাকিয়া গেল। তখন তাহার বয়ঃক্রম মাত্র ষোড়শবর্ষ।

সেই বয়সে রামদুলাল যাহা করিল, তাহা তাহার অপেক্ষা অধিক বয়সের ছেলেরা, মাষ্টারের কাছে পড়িয়া, টাকা খরচ করিয়া, রাশি রাশি বই কিনিয়া—সকল প্রকারের শিক্ষার সুযোগ পাইয়াও করিতে পারে না। কিন্তু ষোড়শবর্ষীয় রামদুলাল তাহার অধিক আর লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে পারিল না।

তখন আর তাহার লেখাপড়ায় সময় কাটাইবার মত অবস্থা নহে। ভিক্ষুক বৃদ্ধ মাতামহ ও বৃদ্ধা মাতামহী দিবারাত্র অকাতর কঠোর পরিশ্রমে যে তাহাদের প্রতিপালন করিতেছেন—একথা সে বালক এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। সে সর্ব্বদাই ভাবিত—কতদিনে একটু মানুষের মত হইয়া উঠিবে, কতদিনে নিজে উপার্জ্জন করিয়া তাহার বৃদ্ধ প্রতিপালকদিগকে সাহায্য করিবে?

সুতরাং ষোল বৎসর বয়সে সে যখন উত্তমরূপ বাংলা শিখিয়া অঙ্ক শিখিয়া, হাতের লেখা পাকাইয়া একটু কাজকর্ম্মের যোগ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহার কেবলই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, এইবারে কোন্ সুযোগে সে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সে একদিন মনোভাব বিনীতভাবে দত্তমহাশয়কে জানাইল।

বালক রামদুলাল স্বভাবগুণে দত্তবাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ মদনমোহন দত্ত মহাশয় সর্ব্বদাই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং বালকের মনের ইচ্ছা অবগত হইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে এই সৎগুণরাশিসম্পন্ন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বালক এখন হইতেই যদি বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

মদনমোহন দত্ত মহাশয় বালকের ইচ্ছা অবগত হইয়া একদিন

তাহার লেখাপড়ার পরীক্ষা লইলেন। বালক রামদুলাল এমন উত্তম-রূপে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মাইয়া দিল যে তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ষোল বছরের বালক সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারে! হাতের লেখা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তদবধি রামদুলালের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই সূত্র ধরিয়াই ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদরিদ্রের সন্তান—অনাথ রামদুলালের সৌভাগ্য সূচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মদনমোহন দত্তের বহুবিধ কারবার ছিল এবং সেই সকল কারবার চালাইবার জন্য একটি আফিস ছিল। সেই আফিসে বিস্তর লোক কর্ম্ম করিত। অনেক গরীবের ছেলেরাও শিক্ষানবীসী করিত।

নন্দকুমার বসু নামে একটি গরীবের ছেলে মদন দত্ত মহাশয়ের আফিসে কাজকর্ম্ম শিখিত। দত্তমহাশয় রামদুলালকে আফিসে লইয়া গিয়া সেই নন্দকুমার বসুর সঙ্গে একত্রে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দু'জনেই দরিদ্রের সন্তান—দু'জনেই আফিসে শিক্ষানবীস—একত্রে যায়, একত্রে বসিয়া কর্ম্ম-কাজ শিক্ষা করে, সুতরাং শীঘ্রই দু'জনে বন্ধুত্ব হইল। দুই বন্ধু একসঙ্গে মিলিয়া আফিসের কর্ম্মকার্য্য শিখিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মদনমোহন দত্তের আফিসে বালকদ্বয়কে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হইত না। তাঁহার নানা প্রকারের কারবার, সুতরাং আফিসেও কার্য্য নানা প্রকার, রামদুলাল এবং নন্দকুমার সকল

রকম কার্য্যই শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা দশটার সময় খাওয়া দাওয়ার পর আফিসে যাইত, আবার সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিত। সেখানেও রামদুলালের কার্য্য শিক্ষা করিবার চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ ও মনোযোগ দেখিয়া উপরওয়ালারা বলাবলি করিতেন—"এ বালক শীঘ্রই খুব উপযুক্ত কাজের লোক হইয়া উঠিবে।"

বালকদ্বয়ের কাপড় অতি সামান্য, খালি পা—জুতা নাই, খালি গা—জামা নাই, সামান্য একটুকরা বস্ত্রখণ্ড চাদররূপে দোছোট লইয়া আফিসে যাতায়াত করে। বিশেষতঃ রামদুলালের আরও হীন অবস্থা—দীন—নম্রভাব, পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। ছুটী বা বিশ্রাম পাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই, আলস্যপূর্ব্বক ফাঁকি দিবার ইচ্ছা নাই, বেশীরকম পরিশ্রম করিবার জন্য ভ্রূক্ষেপ নাই, সর্ব্বদাই অতি যত্নে, পরম সন্তুষ্টচিত্তে, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সাবধানে প্রত্যেক কার্য্যটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লয়—বুঝিয়া লয়—শিখিবার চেষ্টা করে। এই সকল দেখিয়া আফিসশুদ্ধ সকল লোকেরাই তাহাদিগকে ভালবাসে, আদর করে, যত্ন করিয়া কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা দেয়। দেখিয়া শুনিয়া দত্তমহাশয় বড়ই সন্তুষ্ট ও সুখী হন।

একদিন গ্রীষ্মকালে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে, বালক দু'জন আফিসে চলিয়াছে। সেদিন একটু বেলাও হইয়া গিয়াছিল, সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠিয়া অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন—রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে—চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, চাহিতে গেলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তাহার উপর দুপুরের উত্তপ্ত বাতাস রাস্তার অগ্নিকণাসদৃশ গরম ধূলারাশি উড়াইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে, গায়ে লাগিলে সেখানটায় যেন ফোস্কা পড়ে, নিশ্বাস টানিতে গেলে যেন ভিতরটা পুড়িয়া যায়, রাস্তাগুলি জ্বলন্ত আগুনের মত দপ্ দপ্ করিতেছে—কার সাধ্য পা দেয়?

রাস্তায় লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সকলেই দারুণ

রৌদ্রের ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরে আছে—কাহার সাধ্য যে বাহিরে এক পদ চলিতে পারে ?

সেই ভয়ঙ্কর দ্বিপ্রহরে—ততোধিক ভয়ঙ্কর রৌদ্রে বালক দু'জন আফিসে চলিয়াছে। মাথায় ছাতা নাই—গায়ে জামা নাই—পায়ে জুতা নাই—খালি মাথায়, খালি গায়ে, খালি পায়ে রামদুলাল ও নন্দকুমার রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে।

একটুখানি চলিতে না চলিতেই তাহাদের গা-হাত—সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল, মাথার উপর যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, চক্ষু যেন দগ্ধ হইয়া অন্ধপ্রায় হইয়া গেল, পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িবার উপক্রম হইল। ক্রমে তাহাদের মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, শরীরের ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে দারুণ কষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, আর এক পা বাড়াইলেই বুঝি তাহারা ঠিকরাইয়া পড়িয়া মরিয়া যাইবে।

তখন আর পা বাড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া দুই জনে পরস্পর পরামর্শ করিল যে, সে দিন আর আফিসে যাইবে না। তাহাদের কাহারও উপরেই যখন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার অর্পিত নাই, তখন একটা দিন যদি তাহারা যাইতে না পারে, তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ তাহারা কার্য্য শিক্ষা করিতেছে—কয়দিন হইতে উপর্য্যুপরি একটা কাজ লইয়াই সেটা ভাল রকম শিখিয়াছে, আজ গিয়াও তাহাই করিতে হইবে, সুতরাং সে দিনটা কামাই করিলে কোন রকম অনিষ্ট হইবে না।

তাহার উপর নন্দকুমার আরও বুঝাইয়া বলিল যে, সেরূপ ভাবে তাহারা বেশী দূর যাইতে পারিবে না, হয়ত কিছু দূর গিয়াই কোথাও ভির্‌মী লাগিয়া পড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে রক্ষা করিবে কে ? আর

যদিও বা কোন রকমে আধমরা হইয়া গিয়া পৌছিতে পারে, তাহা হইলেও সে দিন আর তাহারা কোন প্রকার কাজকর্ম্ম করিতেও পারিবে না, তাহা হইলে যাওয়া-না-যাওয়া সমান ফল। এরূপ স্থলে এত কষ্ট করিয়া গিয়া কি লাভ হইবে? তাহার অপেক্ষা বরং সে দিনটা বাটীতে ফিরিয়া গিয়া বিশ্রাম করিলে আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারিবে, তারপর পরদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আরও সকাল সকাল বাহির হইবে, তাহা হইলে আর এ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া দুই জনেই তখনি বাড়ীর দিকে ফিরিল—সে দিন আর আফিসে যাওয়া ঘটিল না।

বাড়ীতে আসিয়াই এমন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িল যে, দুই জনে প্রাণ ভরিয়া জল খাইল, বারম্বার মুখ-চোখ ধুইয়া, মাথায় জল চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া দিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে যখন রৌদ্রের উত্তাপটা শরীর হইতে ঘুচিয়া গেল, তখন এমন শ্রান্তি ও অবসন্নতা আসিল যে, আর একমুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে পারিল না।

তখন দুই জনেই শুইয়া পড়িল, ভাবিল একটু জিরাইয়াই—রৌদ্রটা একটু কমিলে উঠিবে। কিন্তু চক্ষু দুইটা কে যেন জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল, তাহারা আর জাগিয়া থাকিতে পারিল না—সেই খানেই অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল। কেমন করিয়া কখন যে ঘুমাইল তাহা আপনারাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

ক্রমে বেলা পড়িয়া গেল, লোকজন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বালকদ্বয়ের সাড়া নাই—শব্দ নাই—এমন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত যে একটিবার পাশ ফিরিয়াও শুইল না।

রামদুলাল যে দিন হইতে আফিসে বাহির হইতেছিল, সে দিন হইতে একটি দিনের জন্যও, সহস্র কারণ থাকিলেও, কোন দিন কখনও

আফিস কামাই করে নাই, সুতরাং সে দিন তাহাকে আফিসে না দেখিতে পাইয়া, সকলেই তাহার কথা শতবার বলাবলি করিতে লাগিল। মদনমোহন দত্ত মহাশয় শুনিয়াই মনে মনে ভয় পাইলেন—তবে কি হঠাৎ বালকের কোন রকম অসুখ হইয়াছে ? মনটা খারাপ হইয়া গেল।

বিকালে আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া দত্তমহাশয় দেখিলেন যে বাহিরের ঘরে ঢালা বিছানার এক ধারে পড়িয়া বালকদ্বয় ঘুমাইতেছে, বেলা পড়িয়া গিয়াছে—তবুও সাড়া নাই। বিশেষ রকম লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, রামদুলালের মুখ শুষ্ক—চুল রুক্ষ—চক্ষের কোল বসিয়া গিয়াছে, মুখে যেন কে কালি লেপিয়া দিয়াছে।

দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন যে, তবে নিশ্চয়ই বালকের কোন না কোন প্রকারের অসুখ হইয়াছে—তাই আজ আফিসে যাইতে পারে নাই, আর চেহারা দেখিয়াও তো সেই প্রকারই বোধ হইতেছে। নহিলে ইচ্ছা করিয়া, কি ফাঁকি দিয়া আফিস কামাই করিয়া ঘরে আলস্যে কাল কাটাইবার ছেলে রামদুলাল নয়।

তিনি ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিতে লাগিলেন। কয়েক বার ডাকের পর রামদুলাল জাগিল এবং দত্তমহাশয়ের গলা শুনিয়া চমকিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সম্মুখেই মনিবকে দেখিয়া রামদুলাল বড় ভয় পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জা পাইল। এরূপ ভাবে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল বলিয়া দারুণ অনুতাপে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল—ইচ্ছা হইল মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মুখ লুকাইয়া রাখে। সে নতমুখে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল—চক্ষু তুলিতে পারিল না।

দত্তমহাশয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার কি অসুখ করিয়াছে, নহিলে আজ অফিসে যায় নাই কেন ?

রামদুলালের বড় ভয় হইল—কি উত্তর দিবে? অন্য বালক হইলে নিশ্চয়ই মিথ্যা করিয়া অসুখের ভাণ করিত, কিন্তু সেই গুণবান সত্যনিষ্ঠ বালক কিছুতেই মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা করিল না। সে আগা-গোড়া একটি একটি করিয়া সকল সত্য কথা জানাইয়া আবার লজ্জায় ও অনুতাপে মুখ নীচু করিল।

দত্তমহাশয় সেই ষোড়শবর্ষীয় বালকের সৎসাহস ও সত্যবাদিতা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, সস্নেহে নম্রভাবে কহিলেন—"কিন্তু বাবা তুমি যদি রৌদ্র ও ধূলা দেখিয়া ভয় পাও, শরীরের কষ্টে পশ্চাৎপদ হও, তবে তো চাকরী পাওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইবে না, আর পাইলেও তো তা বজায় রাখিতে পারিবে না।"

প্রভুর সেই স্নেহমিশ্রিত তিরস্কারের কথায় সেই দিন হইতে রামদুলালের চক্ষু ফুটিল, সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেরূপ অন্যায় কার্য্য সে করিয়া ফেলিয়াছে সেরূপ এ জীবনে আর কখনও করিবে না এবং এখন হইতে প্রাণপাত করিয়াও নিজের শক্তির পরীক্ষা দিবে।

আত্মনির্ভরশীল বালকের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই তাহার উন্নতির সোপান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সংসারে মানুষের উন্নতির দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় আছে। একটি—আত্মনির্ভরতা এবং অপরটি—সাধনা। আপনার পায়ের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত মনপ্রাণের সহিত ঐকান্তিকভাবে সাধনা করিতে পারিলে এমন কোন কার্য্য জগতে নাই—মানুষ যাহাতে সিদ্ধ হইতে অপারগ

হয়। ঐকান্তিক কায়মনোপ্রাণে সাধনার বলে যখন ভগবানকে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তখন সংসারে যে কোন কার্য্যে যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

রামদুলাল সেই যে প্রভুর মৃদু তিরস্কার খাইল, সেই যে শুনিল—'রৌদ্রে ধূলায় ভয় পাইয়া পরিশ্রমে কাতর হইলে চাকরি পাওয়া সহজ হইবে না', সেইক্ষণ—সেই মুহূর্ত্ত হইতে আপনার উপর এমন একটা ঘৃণা ও লজ্জা আসিল যে, মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল ; এবং সেই সঙ্গে মনে মনে একটা বিষম অধ্যবসায় ও সাধনার বল জাগিয়া উঠিল। মনে মনে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংকল্প করিল—'যেমন করিয়া হউক, আজ হইতে সকল রকম অবসাদ দুর করিয়া দিয়া প্রভুকে দেখাইব যে আমি অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারি কি না।'

সংসারে এক রকম স্বভাবের মানুষ আছে যে, কোন রকমে ঘা খাইলে তখন তাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলা হঠাৎ সবলে জাগিয়া উঠে এবং সে হঠাৎ উত্তেজনার বশে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়া কাজ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। কিন্তু দুই চারদিন গত হইতে না হইতে আবার পূর্ব্বের আলস্য ও অবসাদ আসিয়া তাহার সমস্ত শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন সে তাহার সমস্ত প্রতিজ্ঞা রসাতলে দিয়া আবার অলস নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে।

রামদুলাল সে প্রকৃতির বালক নহে। তাহার মনে যে বাসনা প্রবল হইত, যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিত তাহা প্রস্তরে খোদিত হইবার মত—তাহার অন্তরে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যাইত, সুতরাং কোন কালে আর কোন কিছুতেই তাহা মুছিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

প্রভুর মৃদু তিরস্কার খাইয়া মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বালক এবার যে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা জীবনে তো

ভুলিলই না, বরং সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেই দিন হইতেই প্রাণপাত পরিশ্রমে চেষ্টা করিতে লাগিল।

মদনমোহন দত্ত মস্ত কারবারী লোক,—নানা প্রকারের কারবার লইয়াই তাঁহার আফিস, সুতরাং কলিকাতার বাহিরে দম্‌দমা, টিটাগড়, ব্যারাকপুর প্রভৃতি নিকট ও দূরবর্ত্তী নানাস্থানে তাঁহার মহাজনী চলিত। সেই সকল স্থানে গিয়া ব্যবসাদার, দোকানদার প্রভৃতি লোকের নিকট হইতে প্রত্যহ তাগাদা করিয়া টাকা আদায় করিয়া আনিবার জন্য অনেকগুলি 'বিল-সরকার'ও তাঁহার আফিসে খাটিত। দিনকতক পরেই রামদুলাল প্রভুকে বলিয়া কহিয়া সম্মত করিয়া সেই রকম একটি বিল-সরকারের কর্ম্ম-গ্রহণ করিল। মাহিনা হইল মাসিক পাঁচ টাকা।

মাহিনা সামান্য বলিয়া বিল-সরকারের কর্ম্ম বড় সহজ নহে। অত বড় দায়িত্বপূর্ণ কঠোর পরিশ্রমের কার্য্য খুব কমই আছে। বিল-সরকারগণকে প্রত্যহ যথাসময়ে আফিসে উপস্থিত হইয়া কাহার কাছে কত পাওনা—তাহার হিসাবের বিলগুলি বুঝিয়া লইতে হয়, তারপর সেই বিল-অনুযায়ী নানাস্থানে হাঁটিয়া গিয়া টাকা আদায় করিয়া আনিয়া আবার আফিসে আসিয়া জমা দিতে হয়। সুতরাং সে কার্য এক জায়গায় বসিয়া করা যায় না। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বিশ্বাসী লোক না হইলে কেহই বিল-সরকারী করিতে পারে না।

রামদুলাল সেই কঠোর পরিশ্রমের বিল-সরকারী কার্য্য পাইয়া প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দম্‌দমা, ব্যারাকপুর, টিটাগড় প্রভৃতি নানা স্থানে হাঁটিয়া গিয়া পাওনা টাকা আদায় করিয়া আনিতে লাগিল। রৌদ্র-ধূলায় দৃষ্টি নাই—ঝড়-জলে ভ্রূক্ষেপ নাই—শীত-গ্রীষ্ম লক্ষ্য নাই—অনবরত ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলিয়া প্রতিনিয়ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। এমন কি, একদিনে এক জায়গায় দুইবার যাইবার

প্রয়োজন হইলে তাহাতেও সে বিমুখ হইত না—যত পথ চলিতে হউক—যতই পরিশ্রম হউক না কেন—কোন বিষয়ে গ্রাহ্য না করিয়া সে প্রতিদিনের আদায়-উসুলের কার্য্য প্রতিদিন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে লাগিল। বালকের এইরূপ কঠোর অধ্যবসায় দেখিয়া দত্ত-মহাশয় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন।

পরিশ্রম অত বেশী কিন্তু মাহিনা কেবলমাত্র পাঁচটি টাকা। রামদুলাল তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু উপরি পাওনা থাকিলেও সে তাহা কিছুতেই গ্রহণ করে না। মাহিনা সামান্য বটে, কিন্তু তাহারও ত খরচ তেমন বিশেষ কিছুই নাই—সে দুই বেলাই প্রভুর গৃহে আহার করে—যেমন দীন-দরিদ্র, তেমনি নিতান্ত সাদা-সিদা ভাবে চলে, সুতরাং সময়ে সময়ে সামান্য দুই চারি পয়সা ব্যয় ভিন্ন তাহার মাহিনার সমস্ত টাকাই জমিতে থাকে। এইরূপে দেখিতে দেখিতে তাহার হাতে একশত টাকা জমিয়া গেল। একশত টাকা আর যাহার পক্ষে যতই কম হউক, দীন-দরিদ্র—পথের কাঙ্গাল রামদুলালের মত বালকের পক্ষে তাহা সামান্য নহে। একত্রে একশত টাকা জমিতে দেখিয়া—সে টাকায় কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

টাকা ঘরে পড়িয়া থাকিলে বাড়ে না—খাটাইলেই বৃদ্ধি হয়—ইহা রামদুলাল দত্ত-মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া চাক্ষুস দেখিয়া আসিতেছে, সেই স্থানে বাস করিবার এবং সেই আফিসে কর্ম্ম করিবার ফলে তাহার মস্তিষ্কে নানা রকম ব্যবসায়-বুদ্ধি আসিয়াছে। সে তাহার অভিভাবকগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই টাকাগুলি বাগবাজারে একটা কাঠের আড়তে খাটাইতে দিল এবং সময় পাইলেই নিজে গিয়া দেখাশুনা করিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই সেই টাকায় যে আয় হইতে লাগিল

রামদুলাল সে সমস্তই মাতামহকে দিতে লাগিল, তাহাতে তাহার মাতামহের সংসার অনেক স্বচ্ছল হইল। ইহাতে রামদুলালের মনে যেমন আনন্দ হইল—তাহার মনিব দত্ত-মহাশয়ও তাহার অপেক্ষা কম আনন্দিত হইলেন না। তখন হইতে বালকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল এবং অল্প দিন পরেই তিনি রামদুলালকে বিল-সরকারের কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দিয়া দশ টাকা বেতনে জাহাজ-সরকার করিয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিল-সরকারের কাজ যতই কঠিন হউক না কেন—জাহাজ-সরকারের কাজ তদপেক্ষায় শতগুণ কঠিন। জাহাজে মাল বোঝাই দেওয়া এবং জাহাজ হইতে মাল খালাস করিয়া লওয়া, যে কত কঠিন ব্যাপার তা' যাঁহারা কখনও সে কাজ না করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।

এক তো, ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে সর্ব্বদাই নদীর উপর থাকিতে হয়, তাহার উপর একটি একটি করিয়া প্রতি মালটি গণিয়া সাহেবদের দেখাইয়া বুঝাইয়া বোঝাই দিয়া সই লইতে হয়, আবার খালাস করিবার সময়েও তেমনি সতর্ক হইয়া এক একটি করিয়া গণিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। একটুখানি অমনোযোগে কিম্বা অসতর্কতায় যে কত লোকসান হইতে পারে তাহার ঠিকানা নাই।

এদিকে জাহাজী-গোরাদের সঙ্গে সেই সব মাল গণনা লইয়া সর্ব্বদাই গোলমাল এবং বচসা হয়---কেহই ঠকাইতে পারিলে ছাড়ে না, সুতরাং তাহার ফলে প্রায়ই গোরাদের নিকট হইতে গালাগালি এবং লাথি, চড় ও ঘুষি খাইতে হয়। একটুখানি অমনোযোগী হইলে অমনি

নিবের বিস্তর টাকা ক্ষতি হইয়া যায়—সুতরাং সর্ব্বদাই চারিদিকে সতর্ক চক্ষু রাখিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই কঠোর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়।

রামদুলাল নব-যুবক হইয়াও, অম্লানবদনে গোরাদের সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিল। সকলেই দেখিল যে তেমন সতর্ক-দৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ম্মঠ যুবাকে কিছুতেই ঠকাইবার উপায় নাই—সুতরাং দত্ত-মহাশয়ের জাহাজের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খল-ভাবে চলিতে লাগিল।

সেই কার্য্য করিতে করিতে রামদুলালও এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাশালী হইয়া উঠিতে লাগিল যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অতি কুটীল ব্যাপারটিও তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সে অচিরকালের মধ্যেই একজন খুব হিসাবী পাকা কাজের লোক হইয়া উঠিল। তখন তাহার প্রভুও অন্যান্য সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা তাহার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হইয়া অগাধ বিশ্বাসে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই সময় হইতে রামদুলালকে কেবলমাত্র কলিকাতা-বন্দরের জাহাজের কাজে আবদ্ধ না থাকিয়া—দূরে দূরে—ডায়মণ্ডহারবার এবং হুগলী-বন্দরে গিয়াও সে সব কার্য্য করিতে হইত। ইহাতে কার্য্যের দায়িত্ব এবং কঠোরতা যত বাড়িল বিপদের মাত্রাও তদপেক্ষা কম বৃদ্ধি হইল না।

কলিকাতা হইতে রামদুলালকে সর্ব্বদাই নৌকা করিয়া ডায়মণ্ডহারবার এবং অন্যান্য স্থানে যাইতে হইত। একবার জোয়ারের বেগে নৌকা উল্‌টাইয়া গিয়া রামদুলালের জীবন সংশয়াপন্ন হইল। কোনমতে জলের উপরে শরীর ভাসাইয়া রাখিয়া স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে খিদিরপুরে আসিয়া উঠিয়া রক্ষা পাইল। অন্যবার ডায়মণ্ড

হারবারের বিশাল নদীতে ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া অতি কষ্টে এক দরিদ্রের কুটীরে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

এই প্রকার বিপদাপদ প্রায়ই ঘটিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রামদুলালকে প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যকার্য্যে পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না, বরং এই সকল বিপদাপদের মধ্যে পড়িয়া তাহার সাহস, বল, বুদ্ধি, ভরসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডায়মণ্ডহারবারে গমনাগমন করিতে সে শত বিপদ আপদকে গ্রাহ্য করিল না।

তখনকার দিনে প্রায়ই মাঝে মাঝে জাহাজ-ডুবি হইত এবং সেই সকল ডুবো জাহাজ কলিকাতার 'টুলোর' নীলাম আফিসে নীলামের ডাকে বিক্রয় হইত। অনেকে তাহা কিনিয়া বড় মানুষ হইয়া যাইতেন এবং অনেকে একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িতেন।

ডায়মণ্ডহারবারে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে করিতে এবং নানা শ্রেণীর জাহাজী গোরা ও সাহেব সুবোর সঙ্গে মিশিতে মিশিতে রামদুলালের যেমন চলনসই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলা অভ্যাস হইয়াছিল, তেমনি একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপারেও তাহার চক্ষু পড়িয়া জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। লোকের মুখে ঠিক বর্ণনা শুনিয়া সে ডুবো জাহাজের একটা আন্দাজ মত হক্‌দর স্থির করিয়া দিতে পারিত। ডায়মণ্ডহারবারে যাতায়াত করিবার পথে নৌকার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া সে নিত্য সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিত।

এইরূপে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই হুগলীর মোহানায় একখানা মাল বোঝাই জাহাজ ডুবিয়া গেল। রামদুলাল ডায়মণ্ডহারবার যাইবার পথে অভ্যাসমত অনুসন্ধান করিতে করিতে সে কথা শুনিল এবং ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজে-জাহাজে অনেক সাহেব সুবোর এবং অন্যান্য নানা লোকের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মনে মনে তাহার একটা আন্দাজমত দর ঠিক করিয়া স্থির হইল। সে যখন যে বিষয়টা

জানিবার জন্য উৎসুক হইত, তখন তাহার সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত না জানিয়া লইয়া ছাড়িত না—এ কেবল স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই করিত।

কিন্তু ভগবান যে এবার এমনিই একটা কৌতূহলের ভিতর দিয়া যুবকের ভাগ্যসূত্র যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহা সে কি স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারিয়াছিল?

রামদুলাল নিত্যই প্রায় ডায়মণ্ডহারবারে যাতায়াত করে—নিজের কাজ করিয়া ফিরিয়া আসে—পথে যে ডুবো জাহাজের খবর পায় তাহার সম্বন্ধে মনে মনে একটা মূল্য স্থির করিয়া লোকের কাছে গল্পও করে। কেউ কেউ শুনিয়া হাসে, কেউ কেউ উপহাস করে, কিন্তু সে বিষয়ে যুবকের যে যথার্থ একটা গভীর জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা কেহ ভুলিয়াও ভাবে না। রামদুলালও সে সম্বন্ধে লোকের বক্তব্য গ্রাহ্য না করিয়া আপনার জ্ঞানালোচনা লইয়া আপনিই সন্তুষ্ট থাকে।

এইরূপে মাসখানেক কাটিয়া গেল—হুগলীর মোহানার সেই ডুবো জাহাজখানার কথা রামদুলালের মনে চাপা পড়িয়া গেল—আবার নূতন নূতন ডুবো জাহাজের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। সেই সময়ে একদিন তাহার প্রভু দত্তমহাশয় নীলাম হইতে কতকগুলি দ্রব্য কিনিবার জন্য টাকা সঙ্গে দিয়া রামদুলালকে টুলোর নীলামের আফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

নীলামের আফিসে উপস্থিত হইয়া রামদুলাল দেখিল যে, তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সে যথাসময়ে আসিয়া পঁহুছিতে পারে

নাই—যে দ্রব্য কিনিবার জন্য আসিয়াছিল—সে সকল দ্রব্যের ডাক শেষ হইয়া গিয়াছে।

হতাশ হইয়া রামদুলালের মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল, সে ইতস্ততঃ একটুখানি ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলাম ঘর হইতে চলিয়া আসিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে—হঠাৎ কাণে একটা নূতন বস্তুর নীলামের ডাক পঁহুছিল।

চমকিত হইয়া রামদুলাল ফিরিল এবং পরক্ষণেই শুনিল যে—কিছুদিন পূর্ব্বে হুগলীর মোহানায় যে ডুবো জাহাজখানির বিষয় সে শুনিয়াছিল এবং যাহার সম্বন্ধে মনে মনে একটা মূল্য স্থির করিয়া লোকের কাছে গল্প করায় হাস্যাস্পদ হইয়াছিল—সেই জাহাজখানিই নীলামে উঠিয়াছে। তাহার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইল, ইতিপূর্ব্বে সে নিজের মনে মনেই ডুবো জাহাজের দর করিয়াছে, কিন্তু চাক্ষুস কাহাকেও নীলামে কিনিতে দেখে নাই। এই জাহাজখানি কত দরে বিক্রয় হয় এবং কোন্ ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন, দেখিবার জন্য উৎসুক চিত্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু রামদুলালের কৌতূহল মিটিল না। সে ডুবো জাহাজ-খানির সংবাদ বোধ হয় খুববেশী রকম প্রচারিত হয় নাই—অথবা তাহার অবস্থা ও মূল্য সম্বন্ধে কোন ব্যবসাদারের ততদূর অভিজ্ঞতা ছিল না—সেখানার খরিদ্দার বড় কেহ জুটিল না। যে দুই একজন দুই একবার ডাকিল তাহারাও যেন নিতান্ত অবজ্ঞাভরে এমন অল্পদর ডাকিয়া চুপ করিল যে বেশ বোঝা গেল যে তাহারা কেহই উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে।

জাহাজের দর উঠিতেছে না দেখিয়া নীলামকারী সাহেব একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া শেষবারের মত আবার একবার হাঁকিলেন।

রামদুলালের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে মনে মনে সে জাহাজ

খানির যে মূল্য ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছিল তাহার সিকির সিকি মূল্যেও ডাক উঠিল না দেখিয়া—অত কম মূল্যে সওদাটা হাতছাড়া করিতে ইচ্ছুক হইল না। 'যা করেন ভগবান' বলিয়া সে চৌদ্দহাজার টাকায় ডুবোজাহাজখানা ডাকিয়া লইল।

রামদুলাল অল্পবয়স্ক—যুবক মাত্র, তাহাতে পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে, কাহারই বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে ব্যক্তি চৌদ্দহাজার টাকা নগদ দিয়া কোন কিছু কিনিতে পারে। সুতরাং নীলাম-ঘরে উপস্থিত সমুদয় লোকই তাহার কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল—অনেকে রহস্য করিল। এমন কি নীলামকারী সাহেব পর্য্যন্ত তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"এ সব কাজ তোমাদের নয় বাবু—নগদ চৌদ্দহাজার টাকা এখনি গণিয়া দিতে হইবে। তাহা পারিবে কি? সরিয়া যাও।" বলিয়া তিনি যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু রামদুলালের সঙ্গে তখন প্রভুর প্রদত্ত যথেষ্ট টাকা ছিল। সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপরে নির্ভর করিয়া তৎক্ষণাৎ চৌদ্দহাজার টাকা সেইখানে গণিয়া দিল। ঘরশুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

এইরূপে প্রভুর প্রদত্ত সেই চৌদ্দহাজার টাকায় জাহাজখানি কিনিয়া টাকা দিয়া সে সেই নীলামের আফিসের বিশ্রামঘরে আসিয়া বসিল। নীলাম-ঘরে তখন আবার অন্য দ্রব্যের ডাক আরম্ভ হইল।

সেই সময়ে একজন সাহেব অত্যন্ত দ্রুতগতি আসিয়া সেই নীলাম-ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে—"হুগলীর মোহানার ডুবো জাহাজ নীলামে উঠিতে দেরী কত?"

ঘরশুদ্ধ লোক একবার চমকিত হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল, তারপরে জানাইল যে, সেই ডুবো জাহাজখানা এইমাত্র নীলাম

হইয়া গিয়াছে এবং একজন বাঙ্গালী যুবক তাহা চৌদ্দহাজার টাকায় কিনিয়া লইয়া টাকা দিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া, সাহেব হাত কামড়াইতে লাগিলেন—তাঁহার আর আপশোষের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুবকের নাম কি এবং বাড়ী কোথায় ?"

নীলামকারী সাহেব তাঁহার খাতা দেখিয়া রামদুলালের নাম ধাম বলিয়া কহিলেন—"সে যুবক সম্ভবতঃ এখনও আমাদের বিশ্রামঘরেই রহিয়াছে, এই বিক্রয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র এখনও লইয়া যায় নাই।"

শুনিয়াই, সাহেব আর কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে সেই বিশ্রামঘরের দিকে চলিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়াই রামদুলালকে পরিচয়ে চিনিয়া লইয়া, তাহার সঙ্গে সেই ডুবো জাহাজখানা বেচিয়া ফেলিবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

রামদুলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহেবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল যে, সেই ডুবো জাহাজখানার সে যেরূপ মূল্য আন্দাজ করিয়াছিল—তাহার মূল্য তদপেক্ষা কিছুতেই কম নহে—বরং বেশী। তাহার অন্তর আহ্লাদে যেন নাচিয়া উঠিল।

সাহেব তাঁহার কাছে সেই জাহাজখানা বেচিয়া ফেলিবার জন্য রামদুলালকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, রামদুলালও তখন সুযোগ বুঝিয়া দর করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া দর-কষাকষির পরে সাহেব তাহাকে জাহাজখানার দর একলক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইলেন।

তখন রামদুলাল আর অমত করিল না, নগদ একলক্ষ চৌদ্দহাজার টাকা সাহেবের কাছ হইতে লইয়া—সেই খানেই ডুবো জাহাজখানা সাহেবকে আবার বেচিয়া ফেলিল।

এইরূপে 'টুলোর' নীলামঘরে প্রভুর জন্য কতকগুলি দ্রব্য

কিনিতে গিয়া—সেদিন ঘণ্টা কতকের ভিতরে রামদুলাল নগদ একলক্ষ টাকা একেবারে উপার্জ্জন করিল।

এরূপ আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে কেহই আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারে না—লোকে আনন্দের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হয়তো পাগল হইয়া যায়,—নয়তো তখনই ভয়ানক ধুমধাম লাগাইয়া দেয়। কিন্তু আজন্ম দুঃখ-দারিদ্র্য ও কঠোরতার ক্রোড়ে পালিত যুবক রাম-দুলালের ধৈর্য্যের সীমা ছিল না। টাকা লইয়া সে অত্যন্ত নম্রভাবে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত টাকা প্রভুর কাছে দিয়া ভয়ে ভয়ে বিনীত-ভাবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

দত্তমহাশয় ব্যাপারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ এত টাকা রামদুলাল কোথা হইতে কেমন করিয়া আনিয়া দিল ?

তারপর সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে রামদুলাল তেমনই নম্র—সঙ্কুচিত ভাবে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরশুদ্ধ সমস্ত লোকের বিস্ময়ে মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। দত্তমহাশয় ক্ষণকাল মহাবিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গভীর শ্রদ্ধাভরে যুবকের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে, সেই একলক্ষ টাকা তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কহিলেন—

"রামদুলাল, এ টাকা সমস্তই তোমার—তুমি উপার্জ্জন করিয়াছ, তুমিই গ্রহণ কর—আমি উহার এক কপর্দ্দকও লইব না। ভগবান তোমার সহায়—তিনিই তোমাকে দিয়াছেন, অতএব লইতে সঙ্কোচ করিও না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—তোমার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। চিরকাল এমনি ভাবেই সৎপথে থাকিয়া, লোভ দমন করিয়া, স্থিরবুদ্ধির সহিত কার্য্য করিয়া যাও—তাহা হইলে দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।"

প্রভুর কথায় রামদুলাল আর চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, আনন্দে—কৃতজ্ঞতায় দুইচক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু বহিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক টাকাগুলি লইয়া তেমনি নম্রভাবে প্রস্থান করিল।

রামদুলাল চলিয়া গেলে দত্তমহাশয় উপস্থিত সকলকে কহিলেন—

"এমন সচ্চরিত্র, নির্লোভী, ধর্ম্মপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধীর, সহিষ্ণু, কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক আমি আর দুটি দেখি নাই। আমার পরম সৌভাগ্য যে এমন অমূল্য-রত্ন আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি। মা লক্ষ্মী উহার সঙ্গে ফিরিতেছেন, ও যাহাতে হাত দিবে তাহাতে সোণা ফলিবে, উহার সংশ্রবে আসিয়া অবধি আমার কারবারের শতগুণে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—জগদীশ্বর উহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দরিদ্রের দুঃখ দূর করুন।"

বৃদ্ধ দত্তমহাশয়েরও চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। রামদুলালের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে তিনি ঐকান্তিক প্রাণে প্রার্থনা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হইলও তাই। সেইদিন হইতে—কুহক দণ্ড স্পর্শে যেমন অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়—রামদুলালের স্পর্শেও যেন ধূলার মুঠা সোণা হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামদুলালের ব্যবসায়-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই টাকাগুলিতে নানা প্রকারের কারবার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক কারবারেই অতি শীঘ্র

উৎকর্ষ লাভ করিয়া উঠিল—প্রত্যেক কারবার হইতেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই দীন হীন অন্নের কাঙাল রামদুলাল একজন ধনকুবের হইয়া উঠিলেন, চতুর্দ্দিকে মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রসারিত হইল—দেশ-বিদেশে সুনাম রাষ্ট্র হইয়া গেল। এখন আর কে বলিবে যে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষই সেই দুইদিন পূর্ব্বের দীন দুঃখী, পরান্নে পরাশ্রয়ে পালিত, দশ টাকা বেতনের জাহাজ-সরকার সেই যুবক রামদুলাল সরকার?

বড় হইলে লোকে পূর্ব্বের দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হয়—কিন্তু পরমধার্ম্মিক রামদুলাল তাহা হইলেন না। পূর্ব্বে যেমন নিতান্ত সাদা-সিধা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলনে চলিতেন, এখনও সেগুলি ঠিক তেমনই বজায় রাখিলেন এবং প্রভু মদনমোহনের সেই চাকরিই তাঁহার লক্ষ্মীশ্রীর মূল সোপান জানিয়া তখনও সেইভাবে সেই চাকরি করিতে লাগিলেন। এমন মহৎ অন্তঃকরণ যাঁহার—জগদীশ্বর কি তাঁহাকে উন্নত না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন?

এদিকে যেমন রামদুলালের কারবারে দিন দিন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল, ওদিকে তেমনি এদেশের এবং বিলাত ও আমেরিকার বণিকসমাজেও পরমধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়বান প্রখর বুদ্ধিশালী মহাসম্ভ্রান্ত বণিক বলিয়া তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইল।

বড় বড় সাহেব বণিকের দল আসিয়া রামদুলালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার নামে কারবার চালাইতে লাগিলেন—অনেকে তাঁহার হস্তে পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত করিলেন—অনেকে তাঁহাকে শুধু নামটুকুর জন্য অংশ দিয়া কার-বারের ভাগী করিয়া লইলেন। ভগবানেরও তাঁহার উপর এমন অপরি-সীম করুণা যে রামদুলাল—যে কোন উপলক্ষ্যে যে কোন কারবারের সংশ্রবে আসিলেন, তাহাতেই যেন সোণা ফলিতে লাগিল। সুতরাং এই সকল হইতেও তাঁহার যেমন নিত্য অজস্র অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল—তাঁহার নামও তেমনি দেশদেশান্তরে মহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বণিকসম্প্রদায়ের জপমালা হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে রামদুলাল ধন-কুবের হইয়া উঠিলেন, যে সম্মান রাজা-রাজড়া পাইয়া থাকেন তিনিও তেমনি সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড, চীন ও আমেরিকার বড় বড় বণিকগণ উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে লাগিলেন—অনেকে দেশে থাকিয়াই তাঁহার মারফৎ মাল পাঠাইয়া কারবার চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দীনের সন্তান রামদুলাল কেবল নিজের সততা, অধ্যবসায় এবং সাধনার বলে ভারতের সমস্ত বণিকসম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি চালনে টাকার বাজার উঠিতে পড়িতে লাগিল।

আমেরিকার বণিকসম্প্রদায় তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ রামদুলালকে 'জর্জ্জওয়াশিংটন'এর একখানি বহুমূল্য তৈল-চিত্র উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এত বড় লোক হইয়াও কিন্তু রামদুলালের স্বভাবের বা চাল-চলনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল না। তেমনি বিনীত—তেমনি মিষ্টভাষী—তেমনি দরিদ্রবৎ নিতান্ত মোটা সোটা সাদা-সিধা রকমের পরিচ্ছদধারী রহিলেন এবং এই মহৎ গুণরাজিই তাঁহাকে গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল।

বড় মানুষ হইয়া রামদুলাল দীনদরিদ্রগণকে ভুলিলেন না—তাঁহাদের জন্য তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার অবারিত রাখিয়া দিলেন। প্রত্যহ চারিশত দরিদ্র প্রতিবাসী তাঁহার গৃহ হইতে দুই বেলাই ভোজনের পরিমিত চাউল এবং অন্যান্য সমস্ত উপকরণাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তা ছাড়া নিত্য যে কত গোপনে দান চলিল—তাহার সীমা সংখ্যা নাই। তিনি এমনই গোপনে দান করিতেন যে দক্ষিণহস্তের দান বামহস্ত টের পাইত না।

মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিবারণকল্পে একলক্ষ টাকা দান করিলেন এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সকল প্রকাশ্য দানের অপেক্ষা গুপ্ত দান যে কত অধিক করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিনি নিজে গোপনে কাহার কি অনাটন তাহার তত্ত্ব লইতেন এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বেনামা চিঠির মধ্যে কাহাকেও পঞ্চাশ, কাহাকেও একশত, কাহাকেও ততোধিক টাকার নোট পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার আশ্রিত এবং পরিচিত ও অপরিচিত শত শত ব্যক্তি যে কত প্রকারে ঋণমুক্ত, দায়মুক্ত এবং উপকৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া উঠা অসাধ্য।

কন্যাদায় কিম্বা পিতৃ-মাতৃ-দায়গ্রস্ত হইয়া যে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্রেই একেবারে পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত হইত। কেহ কেহ আবশ্যক মত তাহার অধিকও প্রাপ্ত হইয়া বাঁচিয়া যাইত। তাঁহার নিকট আসিয়া দায় জানাইয়া একদিনের জন্যও কেহ রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই, বরং আশার অতিরিক্ত পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে।

ইহা ভিন্ন রামদুলাল তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে এক বৃহৎ অতিথিশালা খুলিয়া সকল ধর্ম্মের, সকল জাতীয় দরিদ্র লোকের জন্য অহোরাত্র সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। সেখানে প্রত্যহ পাঁচশত লোক আহার পাইতে লাগিল। ভিক্ষুকদের জন্য নিয়ম করিয়া দিলেন —যে কেহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিবে তাহার ঝুলিতে যত চাউল ধরে তত চাউল দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবে—আর যেন তাহাকে অন্যত্র যাইতে না হয়।

এইরূপে সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র ধনকুবের রামদুলাল দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবলমাত্র নিজের সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্ম-পরায়ণতা, অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম, ন্যায়পরতা এবং প্রগাঢ় প্রভুভক্তির গুণে দেশবিশ্রুত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া দেশের ইতিহাসে অনন্ত কালের জন্য অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গুণের চর্চ্চা করিলে যে, সকলেই অন্ততঃ কিয়দংশে তাঁহার সমকক্ষ হইয়াও অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

সম্পূর্ণ।

[illegible] জীবনী।

[illegible] এবং [illegible]

[illegible] ঋণমুক্ত, [illegible]

[illegible]

[illegible] মাইকেল মধুসূদন

৩। বঙ্কিমচন্দ্র

৪। রাজা রামমোহন

৫। কেশবচন্দ্র

৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ

৭। নেপোলিয়ন

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত

৯। রামদুলাল সরকার

১০। কৃষ্ণদাস পাল

১১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

১২। মহম্মদ মহসীন

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী ময়মনসিংহ।